রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজ

গোলাম মুরশিদ

বিশ্বজয় করে নোবেল পুরস্কার পেলেও, পড়শি মুসলমানদের জয় করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথও। মুসলিম সমাজে জীবিত রবীন্দ্রনাত ছিলেন কার্যত মৃত। তবে তিনি যে মুসলমানদের জয় করতে পারেননি, সেই অক্ষমতা তাঁর নয়, সম্ভবত মুসলমানদেরও নয়। এর সত্যিকার কারণ নিহিত ছিলো তখনকার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে, আবার দেশবিভাগের পর মৃত রবীন্দ্রনাথ যে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের কাছে হঠাৎ জীবিত হয়ে দেখা দিলেন তারও কারণ খুঁজতে হবে তখনকার সমাজ এবং রাজনীতিতে। কিন্তু যে-কারণেই হোক, পূর্ববাংলায় মৃত রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জীবিত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে।

বিশ শতকের গোড়ায় মুসলমানদের মধ্যে কেবল উচ্চশিক্ষা নয়, সাধারণ শিক্ষার বিকাশও ঘটেছিল খুবই সামান্য। তাঁরা ছিলেন প্রধানত গরিব কৃষিজীবী। সমাজের ওপর তলার দিকে তাকিয়ে তাঁরা সর্বত্রই দেখতে পেয়েছেন হিন্দু জমিদার, হিন্দু মহাজন, হিন্দু সরকারি কর্মকর্তা, এমনকী, হিন্দু রাজনীতিক। এই হিন্দুরা যে মুসলমানদের ভাই বলে আদর করতেন, তা নয়। বরং এঁদের হাতে নীচের তলার মুসলমানরা অনেক সময়েই শোষিত এবং নিগৃহীত হয়েছে। তার চেয়েও গুরতর মুসলমানরা মাঝেমধ্যে অপমানিতও বোধ করেছেন ছোঁয়াছুঁয়ির কারণে। কাজেই শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু - মুসলমানদের মধ্যে যে - সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, তাকে ভ্রাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচনা করা যায় না।

তদুপরি, শিক্ষার অত্যন্ত সীমিত বিকাশের ফলে মুসলমানরা যে নিজেদের বাঙালি বলে চিহ্নিত করবেন, সে রকম মানসিকতাও তাঁদের গড়ে ওঠেনি। সত্যি বলতে কী তাঁদের পরিচয় কী, এটা নিয়ে ভাববার মতো সচেতনতাও তাঁদের মধ্যে দানা বেঁধেছিলো কিনা সন্দেহ হয়। লিখিত যেসব প্রমাণ মেলে তাতে মনে হয়, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের স্বরূপ সম্পর্কে নিজের কাছে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তাঁর মতো মুসলমান সেকালে কমই ছিলেন। উল্টে, তাঁরা এবং তাঁদের চোদ্দ পুরুষ বাংলায় কথা বলেও তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা কিনা, তা নিয়ে বিশ শতকের গোড়াতেও তাঁরা রীতিমতো বিতর্ক করেছেন। এই পরিবেশে 'রবীন্দ্রনাথ' নামধারী একজন কবিকে অর্থাৎ একজন হিন্দু কবিকে ভালোবাসা দুরে থাক, চিনতে পারাও তাঁদের পক্ষে সহজ ছিলো না। সে জন্যেই, তাঁদের হাতে রাখী পরানো সত্ত্বেও তার তাৎপর্য যদি তাঁরা বুঝতে না পারেন, তা হলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। আশ্চর্য হবার কারণ নেই, হিন্দুঃমুসলমান এক হোক বলে গান গাওয়া সত্ত্বেও, তার মর্ম উপলব্ধি করতে না পারা।

রবীন্দ্রনাথেরও সীমাবদ্ধতা ছিলো বৈকি! মুসলমান প্রজাদের মধ্যে থেকেছেন দীর্ঘকাল, ঘুরে বেড়িয়েছেন মুসলমান - প্রধান পূর্ববাংলার গ্রামের পথে, হোক না বোটে চড়ে। কিন্তু সমাজের উচ্চমঞ্চের সংকীর্ণ বাতায়নে বসে তিনি তাঁদের ঠিক ঠাহর করতে পারেননি। মাঝে মাঝে তিনি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে গেলেও, ভেতরে প্রবেশ করার সাধ্য তাঁর ছিলো না। অন্তর মিশিয়ে নীচতলার মানুষদের অন্তরের পরিচয় তিনি যথার্থভাবে পাননি, মৃত রবীন্দ্রনাথ সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তবে তার জন্যে অকৃপণভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সাতচল্লিশের দেশবিভাগ।

দেড় হাজার মাইল দূরে বিভাষী এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কেবল ধর্মের নামে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন পূর্ববাংলার মুসলমানরা। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, পাকিস্তান হবে তাঁদের সব পেয়েছির দেশ। কিন্তু তাঁদের মোহমুক্তি ঘটতে দেরি হয়নি। দেশের রাজনীতি, প্রশাসন এবং অর্থনীতিতে তাঁরা তাঁদের নায্য হিস্যা পাননি। বরং দেশবিভাগের ফলে তাঁদের বিপুলভাবে বিচলিত করেছিলো রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন। বিতর্ক শেষে ১৯৩৯ সাল নাগাদ যে ভাষাকে তাঁরা নিজেদের ভাষা বলে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার হুকুম যখন এলো পাকিস্তানের নেতাদের তরফ থেকে, সেটাকে তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না, এমনকী, দেশের ঐক্যের নামেও নয়। আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, বাংলা ভাষায় যথেচ্ছভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি— এর কোনওটাই তাঁদের খুশি করেনি। কিছু সময় লেগেছিলো তাঁদের অসন্তোষ ধূমায়িত হতে, কিন্তু বিশাল এক বিস্ফোরণের সঙ্গে তা ছাড়া পেয়েছিলো ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি।

ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গের রাজনীতিকে ভিত্তি ধরে নাড়া দিয়েছিলো। সেই প্রচণ্ড ঝাঁকুনির ফলে কেবল যে মুসলিম লিগ কার্যত লুপ্ত হলো বাংলার মাটি থেকে, তাই নয়, ধর্মীয় পরিচয় ম্লান হয়ে পূর্ববাংলার মুসলমানদের কাছে বড়ো হয়ে দেখা দিলো তাঁদের ভাষিক এবং আঞ্চলিক পরিচয়। এতো দিন তাঁরা আরব-ইরানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলেও হঠাৎ নিজেদের বাঙালি পরিচয় নিয়ে তাঁরা গর্ব প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য কেবল রবীন্দ্রনাথই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন না, বঙ্গিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নামও তাঁদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো। ১৯৪০ -এর দশকে এক সময়ের ''কাফের'' কথিত নজরুল ইসলামকে মুসলমানি লেবাস পরিয়ে গ্রহণ করার প্রয়াস চলেছিলো। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাটের দশকে তাঁরও কাফের পরিচয় পুরোপুরি ঘুচে গেলো। বরং প্রশংসিত হলো তাঁর অসাম্প্রদায়িকতা।

বস্তুত, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতা এবং গভীর ভালোবাসা খুব কম সময়ের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে সরকারি অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হবে এবং কেউ এ ভাষার যথার্থ মর্যাদা না-দিলে তা আদায় করে নিতে হবে। অথবা এ ভাষার বিকৃতি করতে চাইলে তাও ঠেকাতে হবে। আরবি হরফে বাংলা লেখার যে-ষড়যন্ত্র করেছিলো কেন্দ্রীয় সরকার, তা এই সচেতনতার মুখেই নস্যাৎ হয়ে যায়। 'মাহে নও' অথবা 'আজাদের' মতো পত্রিকা জোর করে এবং কৃত্রিমভাবে যে অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি করতে চেষ্টা করেছিলো তাও ব্যর্থ হয়। তখন যাঁরা লিখতেন, তাঁরা খুব জোরের সঙ্গে বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্য রাখতে আরম্ভ করলেন। বাংলা ভাষার

দীর্ঘকালের উত্তরাধিকার তাঁরা গর্বের সঙ্গে তুলে ধরলেন।

একথা বলা যায়, ধর্মের ভিত্তিতে যে-দেশ গঠিত হয়েছিলো, সেই পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে উঠলো।

তবে স্বীকার করতে হবে যে, একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক শাসন এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলেই এই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিয়ানার পরিবেশ গড়ে ওঠা সহজ হয়েছিল। কিন্তু কারণ যাই হোক, হঠাৎ বাঙালিয়ানার যে - জোয়ার এলো, তার ফলে আগের চাইতে অনেক ঘটা করে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, নববর্ষের অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালিত হতে থাকলো। এমনকি, শারদোৎসব এবং বসন্তোৎসবের মতো অনুষ্ঠানও হতে লাগলো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আগের চেয়ে অনেক বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান শোনা গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা ফ্যাশানে পরিণত হলো। বিদেশে লেখাপড়া শিখে যে - শিক্ষকরা দেশে ফিরে এলেন, তাঁদের রেকর্ডপ্লেয়ারের সঙ্গে এলো জেমস ফ্রম টেগোর, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের লংপ্লে রেকর্ড এমনকি, তাঁদের অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত না - বুঝলেও। এই সময়ে অনেকে ছেলেমেয়েদের নাম রাখলেন বাংলায়, বাড়ি এবং দোকানের নামফলক লিখলেন বাংলায়, গাড়ির নাম্বারও। তাছাড়া, অফিস - আদালতেও বাংলায় অনেকে সই করতে আরম্ভ করলেন। মোট কথা, পোশাকে - আশাকে এবং চলনে - বলনে বাঙালিয়ানা একটা অনুকরণযোগ্য ফ্যাশানে পরিণত হলো।

পূর্ববাংলায় রবীন্দ্রনাথের পুনর্জন্ম হলো এই পরিবেশে। যাকে বাঙালি মুসলিম সমাজ কোনওদিন প্রসন্ন মনে আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেনি, তাঁকেই পরিবর্তিত পরিবেশে ভালোবাসলেন পূর্ববাংলার মুসলমানরা এবং মেনে নিলেন নিজেদের কবি বলে। কেবল তাই নয়, এ সময়ের ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতীক এবং অনুপ্রেরণায় পরিণত হলেন রবীন্দ্রনাথ। অপরপক্ষে, সরকার জাতীয় সংহতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথের বিকল্প হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছিলো ইকবাল এবং নজরুলকে, আর চেয়েছিলো তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে দিতে।

এই পরিকল্পনা অনাসুরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনে পাকিস্তান সরকার বাধা দিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও সরকারের রোষ উপেক্ষা করে প্রদেশের অনেকে খুব ঘটা করে এই উৎসব পালন করেন। তারপর ১৯৬৫ সালে ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে সরকার বেতার - টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো বন্ধ করেছিলো। পশ্চিমবাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথ - সহ অন্যান্য কবি-সাহিত্যকের রচনা আমদানিও বন্ধ করেছিলো। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুসলমান কবি-সাহিত্যেকর লেখা পড়ানো হবে কিনা, তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে পরের বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীর ঠিক আগে সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়। তখন যে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়, তার মধ্য দিয়ে কবির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা যতোটা প্রকাশিত, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক প্রতিবাদ। এ সময় থেকে ছায়ানটের রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যে হাজার হাজার লোক হাজির হতেন, তাঁরা অনেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, হয়তো শুধু তাঁর নামই জানতেন। কিন্তু সেই নাম তাঁদের কাছে প্রতিবাদের মন্ত্রে পরিণত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের এই জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সরকার অবশ্য এখানেই থেমে থাকেনি। এর পরেও ১৯৬৭ সালে বেতার - টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানো নিষিদ্ধ হয়। তারও সোচ্চার প্রতিবাদ করেন ছাত্র, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীরা। রাস্তায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে মিছিল বের হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের নিষেধের মধ্য দিয়ে সরকার বাঙালিয়ানার স্রোত ঠেকাতে চেষ্টা করলেও, তার ফল হয়েছিলো একেবারে উল্টো। পূর্ববাংলার লোকেরা আরও বেশি করে রবীন্দ্রনাথেকে নিজেদের করে নিয়েছিলেন। বিদ্যালয় - বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বই পড়ে নয়, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অর্জন করেছিলেন প্রতিবাদী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

এতে তখনকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোও সহায়তা দিয়েছিলো। এসব দল কেবল রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্যাপনে উৎসাহ দেয়নি, বরং দলের কর্মীরাও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। অসম অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত কোনও রেকডিং স্টুডিও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ষাটের দশকে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন, তাঁদের গান শোনার জন্যে, তাঁদের গানের রেকর্ড প্রকাশের জন্যে একটা মহলে বিশেষ আগ্রহ জন্মেছিলো। এই পরিবেশে ১৯৬৯ সালে ছজন শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করা হয় করাচির স্টুডিওতে। তারপর এসব গানের রেকর্ড জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু মুজিব তখন ভাষণ দিয়েছিলেন এই বলে যে জনগণ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চায়। কেবল তা-ই নয়, তারপর থেকে তিনি 'আমার সোনার বাংলা' গানটির কথা বারবার তাঁর ভাষণে উল্লেখ করতে থাকেন। তাঁর উৎসাহ রবীন্দ্রভক্তদের উৎসাহিত করেছিলো এবং তাঁদের সাহস জুগিয়েছিলো।

বস্তুত, বাংলাদেশ - আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ পরিণত হয়েছিলেন একটা প্রতীকে। শেষ পর্যন্ত তাঁর লেখা 'আমার সোনার বাংলা' গানটি যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়েছিলো, তাও প্রমাণ করে তাঁর প্রতি, তথা ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তখন বাঙালিদের ভালোবাসা কী গভীর ভাবে দেখা দিয়েছিলো। এটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ এ জন্যে যে-বাংলাদেশের সংসদ এ গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করার অনেক আগেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছিলো। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এ গান এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য দেশাত্মবোধক গান গেয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা এবং সাধারণ লোকেরা গর্বে আনন্দে, বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথকে কেউ তখন আর নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করল না। বরং সরকারি উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী এবং রবীন্দ্রমৃত্যুবার্ষিকী পালিত হতে লাগলো। ফলে রবীন্দ্রনাথ ফের বই-এর পাতায় বন্দী হলেন; আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হলেন। বেলপাতা দিয়ে নমঃ নমঃ করে মানুষ তখন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দায় সারলো। আবার, অনেকের মনে তাঁর সম্পর্কে পুরানো দ্বিধা দেখা দিলো। রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিলেও তাঁর নামে একটা উল্লেখযোগ্য রাস্তার নামও হলো না। একটা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠলো না। অথচ সেপাই থেকে সিপাহসালার

পর্যন্ত কতো জানা অজানা লোকের নামে শৌচাগার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত তৈরি হলো। মোট কথা, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দিগন্ত জুড়ে দেখা দিলেও, ৭০-এর দশকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ আবার শয্যাশায়ী হলেন। এই পটভূমিতেই যশোরের রবীন্দ্রনাথ রোড পরিণত হয় আর এন রোডে।

তবে এটাই শেষ কথা নয়। এই মুমূর্ষ রবীন্দ্রনাথ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে আততায়ীর হাতে হাতে কেবল শেক মুজিব নন, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা নিহত হওয়ার পর। শোনা গেল মূর্তিপূজার প্রতীক বলে বাংলাদেশের জাতীয়সঙ্গীত বদলে যাবে। এই হুমকির মুখে ধুলো - পড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের খাতা নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা আরও একবার এগিয়ে এলেন। ১৯৬৩ থেকে ছায়ানট যে-বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছিলো, তাতে নতুন উৎসাহের জোয়ার এলো। ফৌজি-রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে রাজনীতি যখন অবদমিত, ধর্মনিরপেক্ষতা যখন কার্যত মৃত, তেমন সময়ে রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক কর্মীরা ১৯৮০ সালে শুরু করলেন জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতি যে - সাড়া দেখা গেলো, তা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি প্রবল। কবিই উৎসাহ জোগালেন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি চর্চায়।

মুজিব - হত্যার ঠিক পর বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সংশোধনের যে কাজ শুরু হয়েছিল, এই দশকেই তার ষোলো কলা পূর্ণ হয়। দুর্বল একনায়করা গদি আঁকড়ে থাকার জন্যে ধর্মের নাম ভাঙান। তার চেয়েও মারাত্মক একাত্তরে দেশের স্বাধীনতার যারা বিরোধিতা করেছিলো সরাসরি এবং সক্রিয়ভাবে, সেই সব লোক এঁকেবেঁকে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রেট্রোডলার এসে মদত জোগায় তাদের। ধর্মনিরপেক্ষতার যে - আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিলো, ঘাতকের নির্দেশে সেই বাংলাদেশে অদ্ভুত উটের পিঠে চড়ে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে চলতে থাকে। চারদিকে ধর্মের উন্মত্ত জিগির আরম্ভ হয়। দেশের অমুসলমানরা পরিণত হন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে। এ সময়ে উপমহাদেশের অন্যত্র যে - কট্টর ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তাও বাংলাদেশকে প্রভাবিত করে। ভারতে বাবরি মসজিদ গুঁড়ো হলে বাংলাদেশে ডজনে ডজনে মন্দির ধ্বংস হয়। ভারতে গৈরিক পতাকা উড়লে বাংলাদেশের চাঁদতারা পতপত করে। ভারতের মাটি মুসলমানদের খুনে রাঙা হলে শত শত মাইল দূরে বাংলাদেশও লাল হয় হিন্দুদের রক্তে। ক্রিকেট খেলায় ভারত হারলে এবং পাকিস্তান জিতলে ঢাকায় বিজয় মিছিল বের হয়। এই পরিবেশ ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুকূল নয়। অথবা অনুকূল নয় রবীন্দ্রচর্চার জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক'বছর আগে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যখন আবার জাতীয়সঙ্গীত বদলানোর প্রস্তাব করেন তখন জনপ্রিয় প্রতিবাদের মুখে তাঁকে ছুটিতে চলে যেতে হয়। যদিও, বাংলাদেশ যখন উজান স্রোতে বহমান, সেই পরিবেশে একই অধ্যাপক তাঁর রবীন্দ্রবিরোধিতার জন্যে কয়েক বছরের মধ্যে পুরস্কৃত হন। এসব চড়াই - উৎরাই সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আজও বাংলাদেশে টিকে আছেন বহাল তবিয়তে। প্রতিকূল পরিবেশেও ঢাকায় রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, রবীন্দ্র পঠনপাঠন নিয়ে উচ্চতর গবেষণা চলে।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের নাম এখনও বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। এই দেশে কেউ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংস্কৃতিবান বলে দাবি করতে চাইলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের নাম নিতেই হয়। ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনে তাঁর গান গাইতেই হয়। এমনকী, ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী শাসন প্রবর্তিত হলেও, পাকিস্তানি আমলের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের আসন আগের তুলনায় শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং একজন ফৌজি রাষ্ট্রপতি সরকারি উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্তও নিয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যারোমিটারের মতো। ঘন অন্ধকারে ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন যতো জোরদার হয়, তাঁর নামের পারদ ততো ওপরে উঠতে থাকে। আর অনুকূল পরিবেশে দেশের প্রতিবাদী আন্দোলন যতো নিস্তেজ হয়, রবীন্দ্রনাথ ততোই পাঠ্যপুস্তকের দিকে সরে যেতে থাকেন।

**আমার রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : বিচিত্রা, দৈনিক স্টেটসম্যান মে ২০০৫